বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খন্ড ২৯ বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৮

বাংলাদেশে কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তা : সমস্যা ও সম্ভাবনা

মাহবুব হোসেন*
উত্তম কুমার দেব

১। ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড হচ্ছে কৃষি। জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য, শিল্পের জন্য কাঁচামাল, নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বনজ দ্রব্যের (বাঁশ, কাঠ, বেত) যোগান দেয় কৃষিখাত। অর্থনীতিতে বিভিন্ন খাতের ক্রমবিকাশের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষিখাতের অবদান ক্রমশ হ্রাস পেলেও বর্তমানে মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ২০ শতাংশ আসে কৃষি থেকে। মোট শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেক নিয়োজিত কৃষিখাতে। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্যচাহিদা পূরণ এবং গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী ৭০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় আয় নিশ্চিত করার জন্য কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দ্রুত বর্ধনশীল নগরবাসীর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্যও কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি জরুরি।

কৃষিখাতের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম দুই দশকে যেখানে ২ শতাংশের কম ছিল সেখানে গত দশকে কৃষিখাতের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৪ শতাংশের মতো। কৃষিখাতের এইরূপ দ্রুত প্রবৃদ্ধিতে শস্যখাতের পাশাপাশি মৎস্য, বন এবং প্রাণিসম্পদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। কৃষিতে শস্য উপখাতের অবদান সর্বোচ্চ, যার পরিমাণ প্রায় ৫৬ শতাংশ। বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য ধান (চাল) সহ গম, ডাল, তেল, চিনি, সবজি, মসলা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান দেয় শস্যখাত। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ধান উৎপাদন সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য চালের উৎপাদন ও দাম খুবই সংবেদনশীল। যার জন্য শস্যখাতসংক্রান্ত নীতি দেশের সার্বিক উন্নয়নের কৌশল ও নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শস্য উৎপাদনের সঙ্গে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার নিবিড় সংযোগ রয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশের পক্ষে নতুন জমি চাষের আওতায় আনা সম্ভব নয়, সেহেতু পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সীমিত জমির উৎপাদিকা (productivity) বৃদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষিপণ্য উৎপাদনের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি হতে হবে আনুলম্বিক। এজন্য এবং উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি নিষ্কাশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ (Ahmed 2001)। বিগত দিনে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার ও সেচ এলাকার প্রসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু নদীগুলোর উজানে ভারতের

---

* লেখকদ্বয় যথাক্রমে নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক এবং উত্তম কুমার দেব, প্রিন্সিপ্যাল সাইন্টিস্ট (অর্থনীতি), আইসিআরআইএসএটি, হায়দারাবাদ, ইন্ডিয়া।

অংশে কৃষিকাজ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে মিঠাপানির ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে তার প্রাপ্যতা দিনদিন কমে আসছে। আগামী দিনগুলোতে সেচের জন্য পানির প্রাপ্যতা আরও দুর্লভ হবে। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে পানির বিবিধ ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আগামী দিনগুলোতে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যনিরাপত্তা অটুট ও বজায় রাখতে পানি ব্যবস্থাপনা বড় ধরনের নিয়ামক ভূমিকা পালন করবে।

কৃষিখাতে এবং খাদ্য উৎপাদনে নিয়মিত প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও বাংলাদেশ খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে নিয়মিত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। এজন্য দায়ী ভূমির দুস্প্রাপ্যতা, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের দামের ব্যাপক ওঠানামা (Deb *et al*. 2009)। প্রধান খাদ্যসামগ্রীর দাম হঠাৎ করে বেড়ে গেলে নিম্ন আয়ের ৩০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা, বিশেষত শ্রমিকশ্রেণি ও অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত জনগণের ক্রয়ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পায়। খাদ্যক্রয়ের সামর্থ্য নির্ভর করে দ্রুত বিকাশমান শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি, সেবাখাতের প্রসারসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর। বাংলাদেশে এখনও মোট শ্রমশক্তির অর্ধেক কৃষি, বিশেষত শস্যখাতে নিয়োজিত; কৃষিশ্রমিক ও ক্ষুদ্রচাষী বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশ। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্যনিরাপত্তা কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্যের সহায়ক মূল্যের উপর নির্ভরশীল।

২। কৃষিখাতের অবস্থা

২.১। উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি

জিডিপির ১২ শতাংশ এবং কৃষিখাতের আয়ের ৫৬ শতাংশ আসে শস্যখাত থেকে। চাল হচ্ছে আমাদের প্রধান কৃষি শস্য এবং বাংলাদেশের মোট আবাদি এলাকার তিন-চতুর্থাংশে ধানের আবাদ হয় (সারণি ১)। অন্যান্য প্রধান শস্যের মধ্যে রয়েছে পাট, গম, আলু ও সরিষা, বিভিন্ন ধরনের ডালজাতীয় শস্য, মরিচ, পেঁয়াজ, সবজি, আখ, তামাক এবং চা। এসব শস্যের যেকোনোটির আওতায় নিয়োজিত ভূমির পরিমাণ মোট আবাদি এলাকার ৪ শতাংশের কম। ভূমির দুস্প্রাপ্যতার কারণে বিগত চার দশকে আবাদি এলাকা খুব একটা বাড়েনি। তবে শস্যের ফলন ও লাভের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শস্যের আওতাধীন জমির পরিমাণে ব্যাপক হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে (সারণি ১)। বোরো ধান, গম, ভুট্টা, আলু এবং সবজি চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ বেড়েছে। অন্যদিকে আউশ ধান, ডাল, তৈলবীজ, তামাক ও আখের আবাদি এলাকা কমেছে।

সারণি ১

বিভিন্ন সময়কালে মোট আবাদি এলাকার বিভিন্ন শস্যের শতকরা অংশ

শস্য	সময়কাল		
	১৯৮০-৮২	১৯৯৯-২০০১	২০০৭-০৯
দানাদার শস্য			
আউশ	২৪.১৯	৯.৯৩	৭.২১
আমন	৩৪.০০	৪০.০০	৪০.০৬
বোরো	৯.৯৪	২৬.২৮	৩৪.০৮
গম	৪.২০	৬.০২	২.৯৭
ভুট্টা	০.০২	০.১৩	১.১৮
অ-দানাদার শস্য			
পাট	৪.৫৫	৩.২৩	৩.২১
আলু	০.৮১	১.৭৮	২.৮৭
আখ	১.২১	১.২৪	১.০২
সরিষা	১.৪৮	২.২২	১.৬৬
তিল	০.৩১	০.২৭	০.২৫
মসুর	০.৬১	১.৩০	০.৮৭
মুগ	০.১২	০.৫৩	০.১৮
ছোলা	০.৪২	০.১২	০.০৯
তুলা	০.২৭	০.২৭	০.০৭
অন্যান্য	১৭.৮৯	৬.৮১	৯.৭৩
সকল শস্য	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎস: লেখকবৃন্দের হিসাব। বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত Statistical Year Book (বিভিন্ন বছর)-এ দেওয়া উপাত্তের ভিত্তিতে।

ধানের উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য লক্ষণীয়। ধানের উৎপাদন (চালের হিসাবে) ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার বছরে ১ কোটি ১০ লাখ টন ছিল, ২০০৯ সালে তা বেড়ে ৩ কোটি ২০ লাখ টনে দাঁড়িয়েছে। আশির দশকে ধানের বার্ষিক উৎপাদন বেড়েছে ২.৮ শতাংশ হারে। ১৯৯০/৯১ সাল থেকে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার হচ্ছে ৩.৫ শতাংশ। আশির দশকের শেষ থেকে মূলত আধুনিক জাতের ধান আবাদের মাধ্যমে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বিগত দুই দশকে শুষ্ক মৌসুমে মূলত নিম্নফলনশীল আউশধানের পরিবর্তে এসব জমিতে উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের আবাদ প্রসারের মাধ্যমে ধানের উৎপাদন বেড়েছে। বাংলাদেশে মোট ধান-আবাদি এলাকার তিন-চতুর্থাংশে বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল আধুনিক জাতের ধানের আবাদ করা হয়। এসব ধানের জাতের বেশির ভাগ আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ইরি) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ব্রি) উদ্ভাবন করেছে (Hossain *et al.* 2006)।

স্বাধীনতা পরবর্তী কয়েকটি গমের উৎপাদন ছিল ১ লাখ টনের নিচে। উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের ফলে ১৯৭৬ সাল থেকে গমের উৎপাদন বাড়তে থাকে। এবং এক দশকের মধ্যেই তা বেড়ে প্রায় ১০ লাখ টনে উন্নীত হয়। আশির দশকের শেষ দিকে বোরোধানের প্রসারের ফলে গম উৎপাদন বৃদ্ধিতে কিছুটা ভাটা পড়ে এবং নব্বইয়ের দশকের শেষ পর্যন্ড় গমের উৎপাদন প্রায় ১৮ লাখ টনে উন্নীত হয়। এরপর থেকে গমের আবাদ কমতে থাকে। বর্তমানে গমের উৎপাদন ১০ লাখ টনের নিচে।

সাম্প্রতিককালে গমের জমিতে ভুট্টার আবাদ বাড়ছে। কৃষি-উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ, গমের তুলনায় বেশি ফলন ও লাভের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া পোলট্রিখাদ্য হিসেবে ভুট্টার ব্যাপক ব্যবহার ও চাহিদার কারণে ভুট্টার নিশ্চিত বাজার ও স্থিতিশীল দাম পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। তাই কৃষকরা ভুট্টা চাষে বেশ আগ্রহী। নব্বইয়ের দশকের শেষ পর্যন্ড় ভুট্টার উৎপাদন ছিল নগণ্য। কিন্তু বর্তমান দশকে অত্যন্ড় দ্রুত গতিতে ভুট্টার উৎপাদন বেড়েছে এবং ভুট্টার আবাদি এলাকা ও উৎপাদন অল্প সময়ের মধ্যেই গমের আবাদি এলাকা ও উৎপাদনকে ছাড়িয়ে গেছে। যেহেতু ভুট্টা মূলত পোলট্রি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাই গমের জমিতে ভুট্টার আবাদ বৃদ্ধি আমাদের প্রধান দানাজাতীয় খাদ্যের জোগানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। স্বাভাবিকভাবেই খাদ্যচাহিদা মেটাতে ধানের উপর বেশি হারে চাপ পড়ছে।

বিগত দুই দশকে আলু এবং সবজির দামের চরম অস্থিতিশীলতার কারণে বছর থেকে বছরান্ড়ে আবাদি এলাকা ও উৎপাদনের ব্যাপক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটছে। এসব উচ্চমূল্য এবং শ্রমনিবিড় ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি টেকসই করতে হলে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেমন, (১) প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ ও পণ্য বিপণনে ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে সারা বছরব্যাপী সরবরাহের মাধ্যমে মৌসুমভিত্তিক দামের অনিশ্চয়তা দূর করতে হবে এবং (২) দেশীয় চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদনের প্রেক্ষাপটে বিদেশের বাজারে রপ্তানির সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। উন্নত দেশসমূহের নিরাপদ খাদ্য এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা ও কঠোর শর্তাবলির কারণে বিশ্বের সবজিবাজারে বাংলাদেশের সবজির প্রবেশাধিকার সীমিত এবং দুরূহ।

ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি দানাজাতীয় শস্যে সবুজ বিপণ্ডবের ফলে ডাল, তেলবীজ, পাট, আখ এবং অন্যান্য শস্যের আবাদ ও উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ কমে গেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থবির হয়ে থেকেছে। গত কয়েক বছর ধরে অনুকূল দাম, নতুন উচ্চ ফলনশীল জাতের উদ্ভাবন এবং এসব শস্যের উপযোগী বিশেষ কৃষি-পরিবেশ-অঞ্চল চিহ্নিত করার কারণে তেলবীজ ও পাটের আবাদ আবার বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.২। প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি

শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে উন্নত জাতের শস্যের উদ্ভাবন ও আবাদের প্রসার। তাছাড়া কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা, বিশেষত অগভীর নলকূপের বিস্ড়ারের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির সাহায্যে সেচ ব্যবস্থার প্রসার খুবই উলেণ্ডখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন শস্যের পাঁচ শতাধিক উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে (Hossain et al. 2006[a], 2006b)। অবশ্য এসব জাতের মাত্র কয়েকটি কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যেমন, ধানের জাতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিআর ১১ (১৯৮১ সালে অবমুক্ত) এবং বিরিধান ২৮ ২৯ (১৯৯৪ সালে অবমুক্ত)। কতিপয় ভারতীয় ধানের জাত যেমন, স্বর্ণা এবং শতাব্দী (মিনিকেট) কৃষক থেকে কৃষকের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে সীমান্ড় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে। উন্নত মানের শস্যদানা, স্বল্প সময়ে আবাদযোগ্য এবং অল্প উপকরণের মাধ্যমে এসব জাত চাষ করা যায় বিধায়

কৃষকরা এগুলোর চাষাবাদে উৎসাহী। কৃষকরা চীনদেশ থেকে আমদানিকৃত হাইব্রিড জাতের ধান (হীরা, জাগরণ, আলোড়ন ইত্যাদি) উলেখযোগ্য পরিমাণে আবাদ করছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কতিপয় বেসরকারি কোম্পানি অবশ্য কন্ট্রাক ফার্মিংয়ের মাধ্যমে দেশেই হাইব্রিড ধান এবং ভুট্টাবীজ উৎপাদন শুর“ করেছে। নিম্নফলনশীল জাতের পরিবর্তে উন্নত জাতের শস্য আবাদের কারণে ফলন বেড়েছে, এককপ্রতি উৎপাদন খরচ কমেছে এবং কৃষকের লাভের পরিমাণ বেড়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে মূল খাদ্যপণ্যের দাম ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সীমিত রাখার অবদান অত্যন্ড় বেশি।

কৃষিপ্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রসারে সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে গড়া সেচ পরিকাঠামো, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। উন্নত ধান ও ফসলের জাতের উৎপাদনশীলতা সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। ১৯৮৯ সালে ডিজেলচালিত সেচযন্ত্রের আমদানি উদারিকরণ ও অন্যান্য বিধিনিষেধ শিথিল করার কারণে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ দ্র“তহারে বৃদ্ধি পেয়েছে (Mandal 1993, Ahmed 1995)। এর ফলে ক্ষুদ্রসেচের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন অগভীর নলকূপ এবং পাওয়ার পাম্পের আমদানি অত্যন্ড় দ্র“ত হারে বেড়েছে। সেচখাতে খুব তাড়াতাড়ি বেসরকারি বিনিয়োগ বেড়ে গেছে। বর্তমানে প্রায় ১৪ লাখ অগভীর নলকূপ বাংলাদেশে এক কোটি কৃষকের জমিতে সেচ দিয়ে যাচ্ছে (GoB 2008)। বর্তমানে মোট সেচ আবাদি এলাকার প্রায় ৭০ শতাংশে সেচের উৎস হচ্ছে অগভীর নলকূপ। গ্রামাঞ্চলে সেচের পানির বাজার সৃষ্টি হয়েছে। সেচ পাম্পের নিকটবর্তী জমিতে সেচযন্ত্রের মালিক টাকার বিনিময়ে সেচসুবিধা দেন। প্রান্ডিক ও ক্ষুদ্র কৃষক, যাদের পক্ষে নিজেদের জমির জন্য ব্যক্তিগতভাবে এ ধরনের সেচ পাম্প ক্রয় করা এবং তার পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ নেই, তারা এই সেচসুবিধা ক্রয় করতে পারছে। সেচকৃত জমির পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ৫৫ লাখ হেক্টর এবং মোট আবাদি জমির (৮০ লাখ হেক্টর) প্রায় ৭০ শতাংশে নিম্নফলনশীল বর্ষাকালীন আউশ ধান এবং গভীর পানিতে চাষযোগ্য বোনা আমনধানের জমিতে এসব ফসলের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল বোরোধানের আবাদ সম্ভব হয়েছে (সারণি ১ দেখুন)। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বোরোধান মোট ধান উৎপাদনে ১০ শতাংশ অবদান রাখত। বর্তমানে মোট ধান উৎপাদনে বোরো ধানের অবদান প্রায় ৬০ শতাংশ। ১৯৮৯/৯০ সাল থেকে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রায় ৮০ শতাংশ আসছে বোরো ধানের আওতাধীন এলাকা বৃদ্ধি এবং উচ্চ ফলনশীল বোরো ধান আবাদের মাধ্যমে (Hossain, 2010)।

বিগত দু দশকে উলেখযোগ্য পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। চাল-গমের নিট আমদানিকারক দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। ডাল, তেল, মসলা, ফল, চিনি, দুধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্যের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ আমদানির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। (সারণি ২)।

সারণি ২

কৃষিজ পণ্য রপ্তানি ও আমদানির (হাজার টনে) ধারা: ১৯৯০/৯১-২০০৮/০৯

(মিলিয়ন ডলার)

কৃষিজ পণ্য	বছর				
	১৯৯০/৯১	২০০১/০২	২০০৬/০৭	২০০৭/০৮	২০০৮/০৯
রপ্তানি পণ্য					
পচা পাট	১০৪	৬১	১৪৮	১৬৫	১৪৭
চা	৪৩	১৭	৭	১৫	১২
কৃষিপণ্য	৮	২৩	৮৮	১২১	১২২
সবজি	৪	১৫	৩০	৬০	৪৫
ফল	১	০	৫	৯	৬
তামাক	২	৫	১৮	২২	৪১
অন্যান্য কৃষিপণ্য	১	২	৩৪	২৯	২০
হিমায়িত খাদ্য	১৪২	২৭৬	৫১৬	৫৩৪	৪৫৫
অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য	৯	১৩	৭৪	১৫৩	২৫৬
মোট প্রাথমিক পণ্য	৩০৬	৩৯১	৮৩৩	৯৮৮	৮৭০
মোট রপ্তানি	১,৭১৭	৫,৯৮৬	১২,১৫৪	১৪,০৮৮	১৫,৫৩৭
আমদানি পণ্য					
চাল	-	১৫	১৮০	৮৭৪	২৩৯
গম	২৯৭	১৭১	৪০১	৫৩৬	৬৪৩
দুধ ও ক্রিম	৭২	৫৯	৮৩	১৩৭	৯৬
মসলা	১৯	১৩	৭৬	৮০	৬২
তেলবীজ	১৬	৭২	১০৬	১৩৬	১৫৯
ভোজ্য তেল	১৫৩	২৫১	৫৮৩	১০০৬	৮৬৫
সকল ধরনের ডাল	২৬	৮৮	১৯৫	৩২৭	২৩৪
নারকেল তেল	৩	৫	-	-	-
চিনি	-	২৩	২৯৪	৩৯৬	৪১৩
সার	৯০	১০৭	৩৫৭	৬৩২	৯৫৫
তুলা	৬৮	৩১২	৮৫৮	১,২১২	১,২৯১
মোট কৃষিপণ্য আমদানি	৭৪৪	১,১১৬	৩,১৩৩	৫,৩৩৬	৪,৯৫৮
মোট আমদানি	৩,৫১০	৮,৫৪০	১৭,১৫৭	২১,৬২৯	২২,৫০৭

উৎস: রপ্তানি সংক্রান্ড় উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো থেকে। আমদানি সংক্রান্ড় উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে।

২.৩। কৃষি ও খাদ্যনীতি

কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে উৎপাদন উপকরণ (বীজ, সার, সেচ, কৃষি যন্ত্রপাতি ও কৃষিঋণ) এবং খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ এবং কৃষিখাতে বিনিয়োগ ইত্যাদির প্রণোদনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি নির্দেশনার ভূমিকা গুর ত্বপূর্ণ। সরকার এসব ক্ষেত্রে অনেক নীতি সংস্কার ও প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করেছে (Ahmed 1995, 2001)। বাজারে উপকরণ সরবরাহের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার বাজারভিত্তিক বিতরণ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করেছে। বীজ, সার, কীটনাশক এবং সেচের জন্য ডিজেল সরবরাহকল্পে ২০০৯ এবং ২০১০ সালে বিতরণ ব্যবস্থায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বেশ কিছু গুর ত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কৃষকদের জন্য উৎপাদন-উপকরণ সরবরাহ কার্ড, কৃষকদের মধ্যে ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি ডিজেল-ভর্তুকির টাকা বিতরণ, খরিফ মৌসুমে খরার প্রকোপ কমানোর জন্য বিনামূল্যে সেচের জন্য বিদ্যুৎ বিতরণ, সার বিতরণের জন্য নতুন ব্যবস্থা চালুকরণ এবং বর্গাচাষীদের জন্য জামানতবিহীন ঋণ সরবরাহ, কৃষিঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি।

শস্যের বাজারসংশিণ্টষ্ট হস্ড়ক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে চাল ও গমের অভ্যন্ড়রীণ সংগ্রহ ও বিতরণ, সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার আওতায় খাদ্যশস্য বিতরণ। চাল ও গমের শুল্কহার পরিবর্তনের মাধ্যমে আমদানির উপর প্রভাব বিস্ড়ার (Deb *et al.* 2009)। অভ্যন্ড়রীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযানের লক্ষ্য হচ্ছে কৃষকরা যেন প্রণোদনামূলক দাম পেতে পারে এবং সরকারি বিতরণ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের একটি উলেণ্টখযোগ্য অংশ যেন অভ্যন্ড়রীণ উৎস থেকে সংগ্রহ করা যায়। নব্বইয়ের দশকের শুর্ণ্টতে সরকার অভ্যন্ড়রীণ সংগ্রহের পরিমাণ খুব কমিয়ে দেয় এবং পরবর্তীতে নব্বইয়ের দশকের শেষ সময় থেকে অভ্যন্ড়রীণ সংগ্রহের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। অবশ্য সংগৃহীত খাদ্যশস্যের পরিমাণ মোট উৎপাদিত খাদ্যশস্যের তুলনায় খুবই কম (তিন থেকে চার শতাংশের মতো) ছিল। গমের ক্ষেত্রে অভ্যন্ড়রীণ সংগ্রহের পরিমাণ ছিল উলেণ্টখযোগ্য। অবশ্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গমের অভ্যন্ড়রীণ সংগ্রহ এবং উৎপাদন দুটোই ব্যাপক হারে কমে গেছে। সরকার বোরো মৌসুমে চালের অভ্যন্ড়রীণ সংগ্রহের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছে।

১৯৯৩ সালে সরকার খাদ্যশস্য আমদানি-রপ্তানিতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। বর্তমানে চাল ও গম আমদানির বেশিরভাগ সম্পন্ন করে বেসরকারি খাত। স্বাভাবিক বছরে চালের আমদানির পরিমাণ কমে গেছে কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের বছরগুলোতে (বন্যা ও সাইক্লোন পরবর্তী সময়ে) চালের আমদানি ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গমের আমদানি বেড়েছে। কারণ হলো: (১) দেশীয় উৎপাদন হ্রাস, (২) খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস যা কিনা সরকার মূলত গম হিসেবে বিদেশ থেকে পেত, এবং (৩) শহরাঞ্চলে গমের আটা ও ময়দা থেকে প্রস্তুতকৃত খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি। ডাল, ভোজ্য তেল, মসলা এবং চিনির আমদানি ব্যাপকহারে বেড়েছে (সারণি ২)। উদাহরণস্বরূপ, ভোজ্যতেলের আমদানির পরিমাণ ১৯৯০/৯১ সালে ছিল ১৫৩,০০০ টন, ২০০৪/০৫ সালে এটা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৭৩,০০০ টনে এবং তারপরে ২০০৮/০৯ সালে দাঁড়ায় ৮৬৫,০০০ টনে। ডাল এবং গমের আমদানির ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। খাদ্য আমদানি ব্যয় বার্ষিক ১০ শতাংশের বেশি হারে বাড়ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি-আয়ের এক-পঞ্চমাংশ ব্যয় হয় খাদ্য আমদানির জন্য। বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের দামের অস্থিতিশীলতার অভিঘাত পড়ছে দেশীয় বাজারে। তাই বিঘ্নিত হচ্ছে নিম্ন আয়ের লোকজনের খাদ্যনিরাপত্তা। এসব পণ্যের ক্ষেত্রে সরকারকে সমন্বিত পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। অগ্রাধিকারভিত্তিক শস্য নির্বাচনের পর কৃষির বহুমুখীকরণের প্রসারের মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব।

২.৪। খাদ্যভোগ এবং পুষ্টি ভারসাম্যহীনতা

খাদ্যের প্রাপ্যতা এবং খাদ্যে প্রবেশাধিকার খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনের প্রধান বিষয়। মাথাপিছু দৈনিক চালভোগের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বেড়েছে এবং বর্তমানে তা গ্রামীণ এলাকায় ৪৭৭ গ্রাম এবং শহরাঞ্চলে ৩৮৯ গ্রাম (সারণি ৩)। শহরাঞ্চলে দানাদার খাদ্যশস্য গ্রহণের পরিমাণ প্রায় স্থবির। এটা নির্দেশ করে যে, খাদ্যভোগের পরিমাণ প্রায় চূড়ান্ড় পর্যায়ে পৌঁছেছে। গমের ভোগ শহর এবং গ্রামাঞ্চল উভয় এলাকাতেই কমে গেছে। আলু এবং সবজিভোগের পরিমাণ শহর ও গ্রাম উভয় এলাকাতেই বেড়েছে এবং বর্তমানে তার পরিমাণ মাথাপিছু দৈনিক প্রায় ২৫০ গ্রাম, যা সুষম খাবারের পরিমাণের প্রায় কাছাকাছি।

সারণি ৩

বিভিন্ন কৃষিপণ্য ভোগের প্রাক্কলন, ২০০৫ সালের আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) অনুসারে

খাদ্যপণ্য	গ্রামীণ এলাকা		শহর এলাকা		জাতীয়
	মাথাপিছু দৈনিক ভোগ (গ্রামে)	মোট ভোগ (মিলিয়ন টন)	মাথাপিছু দৈনিক ভোগ (গ্রামে)	মোট ভোগ (মিলিয়ন টন)	মোট ভোগ (মিলিয়ন টন)
দানাদার	৪৮৯	১৮.৬৫	৪১৭	৫.৮১	২৪.৪৬
চাল	৪৭৭	১৮.১৯	৩৮৯	৫.৪২	২৩.৬১
গম	১২	০.৪৬	২৮	০.৩৯	০.৮৫
ডাল	১৩	০.৫০	১৯	০.২৭	০.৭৬
সবজি	২২১	৮.৪৩	২২৮	৩.১৮	১১.৬১
আলু	৬৩	২.৪০	৬৮	০.৯৫	৩.৩৫
বেগুন	২৫	০.৯৫	২৫	০.৩৫	১.৩০
লাউ	২৭	১.০২	২১	০.২৯	১.৩১
পাতা সবজি	২৯	১.১১	৩২	০.৪৫	১.৫৬
টমেটো	৫	০.১৯	১০	০.১৪	০.৩৩
অন্যান্য	৭২	২.৭৪	৭২	১.০০	৩.৭৪
ফল	৩৪	১.৩০	৩৫	০.৪৮	১.৭৮
মসলা	৫১	১.৯৫	৬৪	০.৮৯	২.৮৪
পেঁয়াজ	১৬	০.৬১	২৬	০.৩৬	০.৯৭
মরিচ	১০	০.৩৮	১০	০.১৪	০.৫২
লবণ	১৬	০.৬১	১৬	০.২২	০.৯৩
অন্যান্য	৯	০.৩৪	১২	০.১৭	০.৫১
তেল/স্নেহজাতীয়	১৫	০.৫৭	২৩	০.৩২	০.৮৯
সয়াবিন/ পামঅয়েল	১০	০.৩৮	২২	.৩১	০.৬৯
সরিষার তেল	৫	০.১৫	১	০.০১	০.১৬
চিনি/গুড়	৮	০.৩০	১০	০.১৪	০.৪৪
মাছ	৪০	১.৫৩	৫০	০.৭০	২.২৩
মাংস/ডিম	১৮	০.৬৯	৩২	০.৪৫	১.১৪
দুধ	৩২	১.২২	৩৬	০.৫০	১.৭২

উৎস: বিবিএস : আয়-ব্যয় জরিপ ২০০৫।

দানাদার খাদ্য এবং সবজিভোগের পরিমাণ বিগত বছরগুলোতে উলেণ্টখযোগ্য হারে বেড়েছে। খাদ্যভোগের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমেছে (সারণি ৪)। তবে মানসম্মত খাদ্যসামগ্রী যেমন ডাল, তেল, মাছ ও প্রাণিজ খাদ্যভোগের ক্ষেত্রে ব্যবধান এখনও অনেক। এসব খাদ্যভোগের পরিমাণ পুষ্টি বিশারদগণ কর্তৃক সুপারিশকৃত সুস্থ শরীর ও কর্মক্ষমতার জন্য প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্যের পরিমাণের তুলনায় বেশ কম। উচ্চ ও মধ্য আয়ের লোকজন চালের ভোগের পরিমাণ কমিয়ে নানা ধরনের খাদ্য ভোগের পরিমাণ বাড়িয়েছে। কিন্তু নিম্ন আয়ের লোকজনের জন্য সুষম খাদ্য গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। চালের তুলনায় ডাল, তেল, মাছ এবং মাংসের দাম অনেক বেশি হারে বেড়েছে (সারণি ৫), যা অ-দানাদার খাদ্যপণ্যের চাহিদা-যোগানের ক্রমবর্ধমান ভারসাম্যহীনতার পরিচায়ক।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খাদ্যপণ্যের দামের অস্থিতিশীলতা ব্যাপক হারে বেড়েছে। দরিদ্র ভোক্তাদের জন্য এটা চিন্তার কারণ। কতিপয় গবেষণায় ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, আগামী দিনগুলোতে আন্তর্জাতিক বাজারের খাদ্যপণ্যের দামের অস্থিতিশীলতা বাংলাদেশে খাদ্যনিরাপত্তার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাই আমাদের কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, যেমন চাল, ডাল, ভোজ্য তেল এবং চিনির চাহিদা পূরণের জন্য বিশ্ব বাজারের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর কৌশল

ও নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণের ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণ এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে এসব পণ্যের দামের অস্থিতিশীলতা হ্রাসের জন্যও তা দরকার।

সারণি ৪

নিম্ন ও উচ্চ আয়ের লোকদের খাদ্যপণ্য ভোগের ধারা

(দৈনিক মাথাপিছু গ্রাম)

খাদ্যপণ্য	নিম্ন আয়ের ২০ শতাংশ পরিবার			উচ্চ আয়ের ২০ শতাংশ পরিবার		
	১৯৮৩-৮৪	১৯৯১-৯২	২০০৫	১৯৮৩-৮৪	১৯৯১-৯২	২০০৫
গ্রামীণ এলাকা						
দানাদার	৩৩২	৩৮৬	৪২৭	৬৬৫	৬৪৭	৫২১
সবজি	৯৮	১১৯	২২৪	২২৮	২৬১	২৩১
ডাল	৫	৮	৮	২২	২৮	১৬
মাছ	১২	১৩	২১	৫১	৬০	৬৪
শহর এলাকা						
দানাদার	৩১৫	৪১৩	৪১৭	৫১৬	৪৭০	৪১৭
সবজি	১০৭	১৪২	২০৭	২৮২	২৮৪	২৮৭
ডাল	১১	১৬	১১	৩৩	২৯	২৬
মাছ	১৮	২৫	৩০	৬২	৮১	৮৯

উৎস: ১৯৮৩/৮৪ এবং ১৯১/৯২ সময়ের জন্য Hossain et al (2005), এবং ২০০৫ সালের তথ্য খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০৫-এর উপাত্তের ভিত্তিতে লেকখবৃন্দের নিজস্ব হিসাব।

সারণি ৫

চালের তুলনায় ডাল, মাছ এবং তেলের দামের ধারা

খাদ্যপণ্য	১৯৭৫-৭৭	১৯৮০-৮২	১৯৯৮-০০	২০০৫-০৬	২০০৮-০৯
ডাল/চাল	১.৫	১.৯	২.৬	২.৮	৩.৬
মাছ/চাল	৪.২	৪.৭	৮.৮	৯.৫	৮.১
তেল/চাল	৬.১	৪.৭	৪.৩	৪.১	৪.৩

উৎস: লেখকবৃন্দের হিসাব, বিবিএস কর্তৃক প্রদর্শিত উপাত্তের ভিত্তিতে।

৪। খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনের চ্যালেঞ্জসমূহ

৪.১। খাদ্যপণ্যের চাহিদা

জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। সত্তরের দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৫ শতাংশ। নব্বইয়ের দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে ১.৪ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ এখনও বার্ষিক ১৮ লাখ। বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে বার্ষিক চাল উৎপাদনের পরিমাণ প্রতি বছরে ৩ লাখ টন হারে বাড়াতে হবে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আর বাড়বে না। ভবিষ্যতে গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে স্থানান্তরের কারণে বর্ধিত জনগোষ্ঠী মূলত শহরাঞ্চলে বসবাস করবে। দ্রুত বর্ধনশীল শহুরে জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধির ফলে তাদের চাহিদা মেটাতে উল্লেখযোগ্য হারে বাজারযোগ্য উদ্বৃত্তের (Marketable surplus) পরিমাণ বাড়াতে হবে। বাজারযোগ্য উদ্বৃত্ত শস্য উৎপাদন নির্ভর করবে মূলত কৃষিখাতে উচ্চ মুনাফা এবং কৃষিপণ্যের অনুকূল বাণিজ্য-শর্তের উপর। স্বল্পমূল্যে ভোক্তাদের কাছে খাদ্যসরবরাহকল্পে বর্তমান সরকার যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এটা তার সঙ্গে

আপাতবিরোধী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারের মাধ্যমে উলেণ্টখযোগ্য হারে ফলন বৃদ্ধি করে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। ফলন উলেণ্টখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা গেলে কেজি বা মনপ্রতি উৎপাদন খরচ কমে যায় এবং কমদামে পণ্য বিক্রয় করার পরও কৃষক লাভবান হতে পারে।

মাথাপিছু চালভোগের পরিমাণ গ্রামাঞ্চলে স্থিতাবস্থায় পৌঁছেছে এবং শহরাঞ্চলে তা কমছে। বাংলাদেশে মাথাপিছু চালভোগের পরিমাণ বিশ্বের সর্বোচ্চ চালভোগকারী দেশগুলোর মধ্যে বেশি। তাই এর পরিমাণ আগামী দিনগুলোতে বাড়ার সম্ভাবনা খুব কম। দ্র ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ক্রমাগত নগরায়নের কারণে অদূর ভবিষ্যতে মাথাপিছু চালভোগের পরিমাণ কমবে বলে আশা করা যায়। ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে জনগণ চাল কেনার পরিমাণ বাড়াবে না। তবে নিজের পছন্দমতো উন্নতমানের চালের জন্য বেশি টাকা ব্যয় করবে। উন্নতমানের চাল ব্যতীত অন্যান্য পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যভোগ বাড়াবে এটাও স্বাভাবিক।

নিম্নোক্ত কারণে অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীর চাহিদা জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি হারে বাড়বে: (১) আয়বৃদ্ধিজনিত কারণে চাহিদা বৃদ্ধি (উচ্চ আয় স্থিতিস্থাপকতা), (২) সাম্প্রতিক সময়ে মাথাপিছু আয়ের উলেণ্টখযোগ্য প্রবৃদ্ধি (বার্ষিক ৪.৫ শতাংশের বেশি) যা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়, এবং (৩) নগরায়ন ও আয়বৃদ্ধির কারণে চাল ব্যতীত অন্য খাদ্যসামগ্রীর অনুকূলে খাদ্য বহুমুখীকরণ। জাতীয় কৃষি কমিশনের রিপোর্টে (১৯৯৯, অপ্রকাশিত) প্রাক্কলন করা হয়েছে যে, জিডিপির প্রবৃদ্ধি বার্ষিক ৭ শতাংশ হলে ২০১০ থেকে ২০২০ সাল নাগাদ খাদ্যশস্যের চাহিদা বার্ষিক ৩.১ শতাংশ হারে বাড়বে।

বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০৫-এ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য সামগ্রীর আয় স্থিতিস্থাপকতাকে 'অলমোস্ট আইডিয়েল ডিমান্ড সিস্টেম' (AIDS) মডেলের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা কীভাবে বাড়তে পারে, তার হিসাব এখানে হালনাগাদ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে (সারণি ৬)। এছাড়া উলিণ্টখিত উপায়ে হিসাবকৃত আয়স্থিতিস্থাপকতা এবং ২০১১-২০২১ সালের প্রাক্কলিত আয়ের বিবেচনায় চাহিদা আগামী দশ বছরে (২০১১-২০২১) কীভাবে বাড়তে পারে, তার হিসাব নিরূপণেরও প্রয়াস নেয়া হয়েছে। উক্তভাবে প্রাক্কলিত চাহিদার পরিমাণ সারণি ৭ ও সারণি ৮-এ দেওয়া হলো। প্রাক্কলিত হিসাব থেকে দেখা যায়, ২০১১-২০১৫ সালে মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৮ শতাংশ এবং ২০১৬-২০২১ সালে মাথাপিছু আয় ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেলে, আয় বৃদ্ধির কারণে দানাজাতীয় শস্যের চাহিদা ২০২১ সালের মধ্যে নিরঙ্কুশভাবে কমে যাবে। কিন্তু ফল, ডাল, তেলবীজ, চিনি প্রভৃতির আয়স্থিতিস্থাপকতা তখন অনেক উচ্চ থাকবে। এসব পণ্যের মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ আগামী দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে অনেক দ্র ত হারে বাড়বে। মাছ এবং প্রাণিজ খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধির হার হবে সবচেয়ে বেশি।

সারণি ৬

বিভিন্ন কৃষিপণ্যের আয় স্থিতিস্থাপকতার প্রাক্কলন

কৃষিপণ্য	ব্যয় স্থিতিস্থাপকতা	আয় স্থিতিস্থাপকতা	প্রাক্কলিত আয় স্থিতিস্থাপকতা	
	২০০৫	২০০৫	২০১১	২০২১
দানাদার	০.৩৫	০.২৫	০.১৮	-০.০৮
সবজি	০.৭০	০.৪৯	০.৪৩	০.৩০
মসলা	০.৮১	০.৬০	০.৫৩	০.৪৪
ফল	১.১৩	০.৮৬	০.৭৪	০.৫৮
ডাল	১.০২	০.৭২	০.৬১	০.৩০
তেল	০.৮৭	০.৫৮	০.৫১	০.৪৩
মাছ	১.২৩	০.৮৬	০.৭১	০.৪৮
প্রাণিজ উৎপাদন	১.৭১	১.২০	১.০২	০.৬৩
সঞ্চয়		১.৪২		

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০৫-এর উপাত্তের ভিত্তিতে AIDS মডেলভিত্তিক হিসাব।

প্রাক্কলিত আয় স্থিতিস্থাপকতা এবং ২০১১-২০১৬ সময় মেয়াদে বার্ষিক মাথাপিছু ৮ শতাংশ আয় বৃদ্ধি এবং ২০১৬-২০২১ সময় মেয়াদে ১০ শতাংশ হারে বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের চাহিদার প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রাক্কলিত চাহিদার পরিমাণ সারণি ৮-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাক্কলিত চাহিদা অনুযায়ী দানাদার শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে বার্ষিক ১.৫ শতাংশ হারে, ডাল, সবজি এবং মসলার চাহিদা বৃদ্ধি পাবে বার্ষিক ৩ থেকে ৪ শতাংশ হারে, ভোজ্যতেল, চিনি ও ফলের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে বার্ষিক ৫ শতাংশের অধিক বেশি হারে, এবং মাছ ও প্রাণিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৮ শতাংশের বেশি হারে চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। তাই অভ্যন্ত্রীণ উৎপাদনের মাধ্যমে আমাদের সকল খাদ্যচাহিদা মেটানো দুষ্কর হবে (Hossain and Deb 2009)।

সারণি ৭

বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের মাথাপিছু ভোগের প্রাক্কলন

(দৈনিক মাথাপিছু গ্রাম)

খাদ্যপণ্য	Benchmark, ২০১১		৬ষ্ঠ পরিকল্পনা ২০১৬		৭ম পরিকল্পনা ২০২১	
	গ্রামীণ	শহুরে	গ্রামীণ	শহুরে	গ্রামীণ	শহুরে
দানাদার						
চাল	৫৩০	৪৩০	৫৩০	৪২০	৫২০	৪০০
গম	১৫	৩০	২০	৩৫	২৪	৪৫
অ-দানাদার						
ডাল	১৫	২২	১৯	২৭	২২	৩৪
তেল	১৭	২৫	২০	৩০	২৪	৩৮
আলু	৭০	৮০	৮০	৯৬	৯৪	১১২
অন্যান্য সবজি	১৭০	১৮০	২০০	২০৮	২২০	২৪০
মসলা	৬০	৭৫	৭০	৯০	৯০	১১২
ফল	৪০	৫৪	৫০	৭৩	৬৫	১১০
চিনি	১০	১৫	১৩	২০	১৭	২৭
অনান্য খাদ্যপণ্য						
মাছ	৪৮	৬২	৬০	৮০	৭৬	১০০
মাংস ও ডিম	২৩	৪২	৩২	৬১	৪০	৮৫
দুধ	৪০	৫০	৫০	৭৩	৬৫	১০০

উৎস: লেখকবৃন্দের হিসাব।

টীকা: প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়েছে ২০১১-২০১৬ সময়কালে মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৮ শতাংশ হারে এবং ২০১৬-২০২১ সময়কালে ১০ শতাংশ হারে বাড়বে।

সারণি ৮

বিভিন্ন শস্যের চাহিদা প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন, ২০১১-২০২১

খাদ্যপণ্য	প্রাক্কলিত চাহিদা (মিলিয়ন)			যোগান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় হার (মার্জিন শতকরা)	
	২০১১	২০১৬	২০২১	৬ষ্ঠ পরিকল্পনা (২০১১-২০১৬)	৭ম পরিকল্পনা (২০১৬-২০২১)
দানাদার					
চাল	২৭.৪০	২৮.৭১	২৯.০০	১.০	০.২
গম	১.০২	১.৪১	১.৮৫	৬.৫	৪.৫
অ-দানাদার					
ডাল	০.৯২	১.২৩	১.৫৬	৫.৮	৪.৫
তেল	১.০৪	১.৩২	১.৭২	৪.৫	৪.৫
আলু	৩.৯৫	৪.৮৮	৬.০০	৪.০	৩.৮
অন্যান্য সবজি	৯.৩৮	১১.৬৭	১৩.৬৪	৪.০	৩.৫
মসলা	৩.৪৮	৪.৩৭	৫.৮৫	৪.৫	৪.০
ফল	২.২৩	৩.২৭	৪.৬০	৬.০	৬.০
চিনি	০.৬২	০.৮৭	১.২২	৬.০	৬.০
অনান্য খাদ্যপণ্য					
মাছ	২.৮১	৩.৮০	৫.০৪	৬.৩	৬.০
মাংস ও ডিম	১.৫২	২.৩৩	৩.২৮	৮.৩	৬.৫
দুধ	২.৩২	৩.৪৬	৪.৮৬	৮.৩	৬.৫

উৎস: লেখকবৃন্দের হিসাব। গ্রামীণ ও শহর এলাকার জনগোষ্ঠীর প্রাক্কলন এবং মাথাপিছু খাদ্যভোগের সারণিক ভিত্তিতে উক্ত হিসাব করা হয়েছে।

৪.২। খাদ্যপণ্যের যোগান বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা

কৃষিকাজের জন্য প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূমি ও পানি, জমির উর্বরতা শক্তির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কৃষি শুমারির উপাত্ত থেকে হিসাব করে দেখা গেছে যে, বার্ষিক প্রায় ১ শতাংশ হারে আবাদি জমির পরিমাণ কমছে। বসতবাড়ি, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনা, পরিবহন অবকাঠামো, নদীভাঙন এবং উপকূলীয় এলাকায় লোনা পানি ঢোকার কারণে এটা ঘটছে। নতুন নির্মাণ করা রাস্তার দুপাশের জমিতে ফ্যাক্টরি ও বাণিজ্যিক স্থাপনা এবং অ-কৃষিজ খাতের সম্প্রসারণ বাংলাদেশের একটি স্বাভাবিক চিত্র। এটা বাংলাদেশের উন্নয়নের একটি ইতিবাচক দিক। নিচু এলাকাসমূহ রূপান্তরিত হচ্ছে মাছ চাষের পুকুর হিসেবে। অন্যদিকে উঁচু জমিগুলো ফলের বাগানে রূপান্তরিত হচ্ছে। ফলে শস্য আবাদের জন্য ভূমির প্রাপ্যতা কমছে এবং এটা চলতে থাকবে বলে ধারণা করা যায়। তাই ফলন বৃদ্ধির হার উৎপাদন বৃদ্ধির চেয়ে বেশি হারে হতে হবে। তা না হলে চাহিদা ও যোগান বৃদ্ধির মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা যাবে না।

শস্যচাষের নিবিড়তা অনেক বেশি হবার কারণে এবং রাসায়নিক সারের মাত্রাতিরিক্ত ও অসম ব্যবহারের কারণে জমির উর্বরাশক্তি হ্রাস পাচ্ছে। বোরো ধান আবাদের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের পরিমাণ বার্ষিক রিচার্জের তুলনায় বেশি হওয়ার ফলস্বরূপ ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে চলে যাচ্ছে এবং পানযোগ্য পানির প্রাপ্যতার উপর তা বিরূপ প্রভাব ফেলছে। দেশের অনেক অঞ্চলে পানীয় জলে আর্সেনিকের উপস্থিতি স্বাস্থ্যসমস্যা তৈরি করেছে। আর এজন্য অগভীর নলকূপের মাধ্যমে ব্যাপক সেচ ব্যবস্থার প্রসারকে অনেকেই দায়ী করে থাকেন। টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে তাই সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করার দিকে আমাদের বেশি করে নজর

দিতে হবে। এজন্য ব্যাপক বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়বে। ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারের জন্য স্থাপিত সেচ প্রকল্পসমূহের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা যে বেশ কঠিন তা গত শতকের সত্তর ও আশির দশকে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প, চাঁদপুর ও মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প পরিচালনায় প্রমাণিত হয়েছে।

বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ড় হবে। সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলে শস্য আবাদের উপযোগী জমির পরিমাণ ক্রমশই কমে আসবে। কেননা এসব অঞ্চলের উলেণ্ঢখযোগ্য পরিমাণ ভূমি লবণাক্ত পানিতে নিমজ্জিত হবে। বর্ষা মৌসুমে অনিয়মিত বৃষ্টির কারণেও শস্য উৎপাদন ব্যাহত হবে। সাইক্লোন, বন্যা এবং খরার ব্যাপকতা ও গভীরতার কারণেও উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ড় হবে। উচ্চমাত্রার ঝুঁকির কারণে বর্ষাকালে উৎপাদন-উপকরণের সর্বোচ্চ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি একটি বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

বাংলাদেশের কৃষি কাঠামোতে ক্ষুদ্র ও প্রান্ড়িক চাষীর আধিক্য রয়েছে (Hossain *et al*. 2006b)। গ্রামীণ এলাকা থেকে দ্রুত শহর এলাকায় জন স্থানান্ড়র সত্ত্বেও কৃষি খামারের সংখ্যা বাড়ছেই। অন্যদিকে খামারের আয়তন হচ্ছে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত ২০০৫ সালের জাতীয় নমুনা জরিপ থেকে জানা যায় যে, ১৯৯৬ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে কৃষকের সংখ্যা বেড়েছে ২৫ শতাংশ। অন্যদিকে ৫০ শতাংশের কম আয়তনের খামারের সংখ্যা বেড়েছে ৬৭ শতাংশ।

বাংলাদেশে বড় আয়তনের খামার খুবই বিরল। তিন হেক্টরের বড় খামার ১৯৯৬ সালে ছিল তিন লাখ (যেখানে মোট কৃষকের সংখ্যা ১ কোটি ১৮ লাখ), ২০০৫ সালে এ সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার। বড় ও মাঝারি আয়তনের জমির মালিক কৃষিকাজ থেকে আহরিত সঞ্চয় অ-কৃষিজ খাতে বিনিয়োগ করেছেন আর কৃষিশ্রমিক ও প্রান্ড়িক চাষীর হাতে কৃষিকাজ ছেড়ে দিচ্ছেন। বর্গাচাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ বাড়ছে। ১৯৯৬ সালে এ ধরনের জমির পরিমাণ যেখানে ছিল মোট জমির ২৩ শতাংশ, সেখানে ২০০৮ সালে তা ৩৮ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রান্ড়িক চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধির এটি অন্যতম কারণ। বর্গাব্যবস্থার ক্ষেত্রেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ভাগচাষের পরিবর্তে নির্দিষ্ট ভাড়ার ভিত্তিতে এক থেকে তিন বছর মেয়াদি নগদ বর্গার প্রচলন বাড়ছে। বর্গাব্যবস্থায় এই পরিবর্তনের ফলে বর্ধিত উৎপাদন থেকে বর্গাচাষীর বেশি লাভ পাবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বন্যা, খরা ও সাইক্লোনের কারণে সৃষ্ট ক্ষতির মাধ্যমে তাদের ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে নগদবিহীন বর্গা প্রথার আওতাভুক্ত জমির ফসল হানি হলে জমির মালিক ও বর্গাচাষী উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ড় হতেন। কিন্তু পরিবর্তিত নগদ বর্গা প্রথায় কেবল বর্গাচাষীকেই চাষের সকল ঝুঁকি বহন করতে হচ্ছে।

দ্রুত হারে শহরাঞ্চলে অভিবাসন, বিদেশ গমন প্রভৃতি কারণে অনুপস্থিত ভূমি মালিকের সংখ্যা বাড়ছে। শোষণমূলক বর্গাব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহে কৃষকের অক্ষমতা, স্বল্প সঞ্চয় ও কৃষিঋণের অপ্রতুলতা, আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি ও কৃষিসম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি বিষয় উন্নত কৃষিপ্রযুক্তির প্রসারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করতে পারে। কৃষিকাজে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও সমস্যা হতে পারে। দ্রুত বর্ধমান শহুরে জনগোষ্ঠীর খাবার জোগানোর জন্য কৃষকের প্রণোদনার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। খামার পর্যায়ে কৃষিপণ্যের দামের অস্থিতিশীলতা খুবই বেশি। ফসল ওঠার সময় বেশিরভাগ

কৃষিপণ্যের দাম থাকে খুবই কম এবং পরে দাম বাড়ে। ফলে মধ্যস্বত্বভোগী এবং বড় কৃষকরা তাদের খামার-উদ্বৃত্তকে মজুদ করে বেশি লাভের চেষ্টা করে।

পূর্বেই উলেণ্টখ করা হয়েছে, আমাদের কৃষিপণ্যের চাহিদার একটি বড় অংশ মেটানো হয় আমদানির মাধ্যমে। বিশ্ববাজারে চালের সরবরাহ খুবই সীমিত এবং ২০০৬ সাল থেকে বিশ্ব খাদ্যবাজারে যোগানের স্বল্পতা ও খাদ্যপণ্যের মূল্যের অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। খাদ্য আমদানিকারক দেশগুলো বিশ্ববাজারের উপর নির্ভরতা হারাচ্ছে। খাদ্যসংকটের সময় বড় রপ্তানিকারক দেশগুলো নিজ দেশে স্বল্প আয়ের লোকদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য রপ্তানি বন্ধসহ নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। ফলে সৃষ্টি হয় বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের দামের মাত্রাতিরিক্ত অস্থিতিশীলতা। এই অস্থিতিশীলতা অভ্যন্ড়রীণ বাজারকেও অস্থির করে তুলছে। বিশ্ববাজারের সংশিণ্টষ্টতার কারণে হঠাৎ দেশীয় বাজারে দামের বৃদ্ধি স্বল্প আয়ের ভোক্তাদের দুর্দশা বাড়িয়ে দেয়। তাই বিশ্ববাজারের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা কমাতে হবে।

৫। উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা

বিরাজমান প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কিছু সুযোগ রয়েছে। এগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল।

উপকূলবর্তী অঞ্চলে এবং সিলেট অঞ্চলে শস্যচাষের নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে ধান-আবাদি এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। ২০০5 সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত নমুনা জরিপে উলেণ্টখিত শস্যচাষের নিবিড়তার তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত একটি চিত্র এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টে প্রদত্ত চিত্র ১এ তুরে ধরা হয়েছে। চিত্রটি থেকে দেখা যাচ্ছে, কম শস্যনিবিড় অঞ্চল হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলবর্তী অঞ্চল, সিলেট অঞ্চল এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। পরিশিষ্ট চিত্র ২ হতে দেখা যাচ্ছে, এসব এলাকায় সেচের প্রসার এবং বোরোধানের আবাদও বেশ কম। ভূ-উপরিস্থ সেচব্যবস্থার মাধ্যমে এসব অঞ্চলের আনুমানিক ১০ লাখ হেক্টর এলাকায় বোরোধানের আবাদ বৃদ্ধি করা সম্ভব। পূর্বে এসব এলাকায় ধানের আবাদ বৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল না। কেননা লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ধানের জাতের অভাব ছিল। বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ব্রি) এবং বাংলাদেশ পারমাণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আবাদের জন্য লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। অধিক লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা চলছে (Hossain and Siraj 2008)।

আমন মৌসুমে উচ্চ ফলনশীল ধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন সীমিত। বৃষ্টিপাত ও বন্যাজনিত ঝুঁকির কারণে কৃষকরা কম হারে উপকরণ ব্যবহার করেন। দেশি জাতের আমন ধানের ফলন হেক্টরপ্রতি ২.০ থেকে ২.৫ টন। অথচ বোরো ধানের হেক্টরপ্রতি ফলন ৫.৫ টন। ল্যাবরেটরি ও গবেষণা-খামারে ফলন ও মাঠ পর্যায়ে কৃষকের প্রাপ্ত ফলনের ব্যবধান (yield gap) কমানোর মাধ্যমে আমন মৌসুমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। আমন মৌসুমে উচ্চফলনশীল জাতের আবাদসংক্রান্ড় তথ্য এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টে প্রদত্ত চিত্র ৩-এ তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রটি থেকে দেখা যায় যে, সিলেট অববাহিকা এবং বন্যাপ্রবণ নদীবহুল এলাকাসমূহ (ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল) আমন মৌসুমের জন্য উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনি। বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি নিমজ্জিত পানিতে টিকে থাকতে পারে এমন ধরনের ধান (স্বর্ণা sub 1, বিআর ১১ sub 1, আইআর ৬৪ sub 1)

উদ্ভাবন করেছেন। এসব জাত পানির নিচে ১০-১২ দিন ডুবে থাকলেও ফলনে তেমন ক্ষতি হয় না (Hossain and Siraj 2008)। নিচু অঞ্চলে সকল ধানের আবাদ বৃদ্ধি এবং মাঝারি উচ্চতার নতুন জাত উদ্ভাবন ও প্রসারের মাধ্যমে আমন মৌসুমে ধানের আবাদ বেশ বাড়ানো সম্ভব। কম শস্যনিবিড় পার্বত্য অঞ্চলে (পার্বত্য চট্টগ্রাম) পাহাড়ের পাদদেশে মাঠ-শস্য এবং পাহাড়ের ঢালে উদ্যান-শস্য, কৃষি-বন ও বৃক্ষরাজির আবাদ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

সম্প্রতি খামার পর্যায়ে কৃষিপণ্যের ভালো দামের কারণে কৃষিকাজে মুনাফার পারিমাণ বেড়েছে। ধান, পাট, ভুট্টা ইত্যাদি পণ্যের দাম আগের তুলনায় অনেক বেশি। অধুনা পরিচালিত আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে দেখা যায়, বেশিরভাগ কৃষিপণ্যের মুনাফার হার বেশ ভালো (হোসেন ও বায়েস ২০০৯)। সর্বোচ্চ মুনাফা পাওয়া যাচ্ছে বোরো ধান, ভুট্টা, তামাক এবং আলুচাষ থেকে। অন্যদিকে ডাল, তেলবীজ, গম ও আলু থেকে নিট আয় তুলনামূলকভাবে কম। আউশ ধান ও আখ থেকে প্রাপ্ত নিট আয় ঋণাত্মক।

সাহাবুদ্দিন (২০০২) ১৯৯০ দশকের শেষ সময়ের উপকরণ-উৎপাদনসহগ ও বাজারে বিদ্যমান দামের ভিত্তিতে ধান ও গমচাষের তুলনামূলক সুবিধার হিসাব করেছেন। ২০০৭/০৮ সালের উপকরণ-উৎপাদনসহগ এবং ২০০৮/০৯ সালে বিরাজমান দামের ভিত্তিতে এই তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে (Hossain and Deb 2009)। উক্ত হিসাব থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়:

- রপ্তানি সমতা দামে বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে আমন ধান, আলু এবং পাট উৎপাদনে। বাংলাদেশ এসব পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিশ্ববাজারে রপ্তানি করে লাভবান হতে পারে।
- আমদানি সমতা দামে বাংলাদেশের তুলনামূলক আর্থিক সুবিধা রয়েছে বোরো ধান ও ভুট্টা আবাদে। বাংলাদেশ এসব পণ্য বিদেশের বাজারে রপ্তানি করতে পারবে না। তবে পরিবহন খরচ, ব্যবসায়ীদের লাভ প্রভৃতি বিবেচনায় নিলে বিদেশ থেকে আমদানির পরিবর্তে দেশে এসব পণ্য উৎপাদন করলে দেশ লাভবান হবে। তাই আমদানি পরিবর্তন হিসেবে এসব পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।
- গম, ডাল এবং তেলবীজ উৎপাদনে বাংলাদেশের তুলনামূলক আর্থিক সুবিধা নেই। তাই এসব পণ্য দেশে উৎপাদনের পরিবর্তে আমদানির মাধ্যমে সংগ্রহ করাই যুক্তিযুক্ত। এসব পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত সম্পদ অন্য কাজে বিশেষত অন্য শস্য আবাদে বিনিয়োগ করলে সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা বাড়বে। অবশ্য এসব শস্যের জন্য কৃষি-উপযোগী অঞ্চল চিহ্নিত করা গেলে অথবা প্রচলিত শস্য ব্যবস্থায় অতিরিক্ত শস্য এবং সাথি ফসল হিসেবে আবাদ করা সম্ভব।

শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির অন্য সুযোগগুলো হলো:

ক) সেচকৃত জমিতে শস্যের ফলনের ব্যবধান হ্রাস

গবেষণা মাঠ ও কৃষকের মাঠে ফলনের তফাত এখনও অনেক বেশি। মানসম্মত বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ১০ শতাংশ ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। সিস্টেম অব রাইস ইনটেনসিফিকেশন (এসআরআই), যা বিভিন্ন শস্য ব্যবস্থাপনা কৌশলের সমন্বয়, এবং এর বিস্তারের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং বাংলাদেশে ধানের ফলন ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে কৃষকের মাঠে। এসআরআই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে (ক) পর্যাপ্ত দূরত্ব রেখে কমবয়সী চারা রোপণ, (খ) কৃষক কর্তৃক ব্যবহৃত ৪-৫টি চারার পরিবর্তে এক বা দুটি চারা ব্যবহার, (গ) পর্যায়ক্রমে সেচকৃত জমি ভেজানো ও শুকানো, এবং (ঘ) রাসায়নিক সারের পরিপূরক হিসেবে জৈব সারের ব্যবহার। এসআরআই পদ্ধতির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সেচকৃত জমিতে ধানের ফলন হেক্টরপ্রতি ১ থেকে ২ টন পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব।

খ) হাইব্রিড ধানের আবাদ বৃদ্ধি

একই পরিমাণ উৎপাদন-উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে হাইব্রিড ধানের উৎপাদন ২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। বোরো মৌসুমে মাত্র ১৫ শতাংশ জমিতে হাইব্রিড ধানের আবাদ হয়ে থাকে। হাইব্রিড ধানের আবাদ প্রসারের মাধ্যমে ধানের ফলন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে বীজের উচ্চ খরচ এবং চালের নিম্নমান। বীজের জন্য বিদেশ নির্ভরতা কমানো এবং উন্নতমানের জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে এ দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

গ) প্রতিকূল পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন

উন্নত প্রযুক্তি না থাকার কারণে বর্তমানে প্রতিকূল কৃষি-পরিবেশ অঞ্চলে শস্যের ফলন খুবই কম। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিজ্ঞানীরা এসব অঞ্চলের জন্য লবণাক্ততাসহিষ্ণু ধানের জাত, পানিতে নিমজ্জিত থাকতে পারে এমন ধানের জাত, তাপমাত্রাসহিষ্ণু ভুট্টা ও গমের জাত এবং স্বল্পমেয়াদি শস্যের জাত উদ্ভাবন করেছেন যার মাধ্যমে প্রান্তিক খরাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। মাঠ পর্যায়ে এসব প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারের জন্য কৃষকদের অংশগ্রহণমূলক যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া চালু করা দরকার।

ঘ) শুষ্ক মৌসুমে খরাপ্রবণ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ডালজাতীয় শস্য ও তেলবীজ আবাদের প্রসার

শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানির দুষ্প্রাপ্যতা মোকাবিলায় এবং তেলবীজের আবাদের প্রসার ঘটাতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বিশেষত বরেন্দ্র অঞ্চলে পানিসাশ্রয়ী ভুট্টা ও সবজি আবাদ বাড়ানো দরকার । উপকূল অঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে সূর্যমুখি তেলবীজ চাষ বাড়ানোর সম্ভাবনা প্রমাণিত হয়েছে। এ সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হলে স্বল্পকালীন শস্যের জাত উদ্ভাবনে মনোযাগী হতে হবে।

৮। উপসংহার

২০০৭/০৮ অর্থবছরে বাংলাদেশকে বিশ্ববাজার থেকে আমদানির ক্ষেত্রে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। নগদ অর্থের বিনিময়েও খাদ্য আমদানি করা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। খাদ্য রপ্তানিকারক দেশসমূহ নিজ দেশের সরবরাহ ও ভোক্তাস্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রায়শই হঠাৎ করে রপ্তানি নিষিদ্ধ করছে। ফলে বাংলাদেশসহ সকল খাদ্য আমদানিকারক দেশ খাদ্যনিরাপত্তা ঝুঁকিতে পতিত হচ্ছে। তাই আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য চালের উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে। এ লক্ষ্যে উপযোগী জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রসারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। প্রতিকূল পরিবেশে

উপযোগী প্রযুক্তি ও উৎপাদনকৌশল, হাইব্রিড ধানের ব্যাপক প্রসার, অধিকতর দক্ষ শস্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যেমন, পানিসাশ্রয়ী সেচপদ্ধতি, এসআরআই প্রযুক্তির প্রসার, লিফ কালার চার্ট ব্যবহারের মাধ্যমে সারব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, ড্রাম সিডারের মাধ্যমে সরাসরি ধানের চারা রোপণের ব্যবস্থা করে এককপ্রতি উৎপাদনখরচ কমাতে হবে।

জমিচাষ ও পানি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে অতিরিক্ত ১০ লাখ হেক্টর জমি বোরো ও আউশ ধান আবাদের আওতায় আনা সম্ভব। বন্যা ও জলনিমগ্নতাসহিষ্ণু ধানজাতের ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে আমন মৌসুমে উৎপাদনের ঝুঁকি হ্রাস করে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। বোরো ধানের তুলনায় আমন ধানের একরপ্রতি উৎপাদন খরচ কম এবং মুনাফার হার বেশি। আন্তর্জাতিকভাবেও আমন ধান উৎপাদনের তুলনামূলক আর্থিক সুবিধা বাংলাদেশের রয়েছে। তাই ভবিষ্যতে আমন ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার দিতে হবে।

কৃষি বহুমুখীকরণ নীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা প্রয়োজন। এজন্য শস্যবিন্যাসভিত্তিক কৃষি গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। স্বল্পমেয়াদি ধানজাতের উদ্ভাবন এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ধানভিত্তিক শস্যবিন্যাসে রিলেক্রপিং বা দুই ফসলের মাঝে অন্তর্বর্তীকালীন শস্য হিসেবে ডালজাতীয় শস্যের আবাদের সম্ভাবনা যাচাই করতে হবে এবং উৎসাহ দিতে হবে। বেসরকারি খাতকে প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ ও মাননিয়ন্ত্রণে বিনিয়োগ উৎসাহিত করে বর্ষব্যাপী চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মৌসুমি যোগানের স্থায়িত্ব বাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এর মাধ্যমে মৌসুমভেদে দামের ব্যাপক অস্থিতিশীলতা ও তারতম্য রোধ করা সম্ভব হবে।

যথাসময়ে অত্যাবশ্যক উৎপাদন-উপকরণ যেমন-বীজ, সার, সেচের জন্য প্রয়োজনীয় ডিজেল সরবরাহ নিশ্চিত করতে ভর্তুকি ও নিয়মিত বাজার পরিবীক্ষণ চালু রাখতে হবে। শস্য অভিযোজন, কৃষকদের অংশগ্রহণমূলক জাত অবমুক্তকরণপ্রক্রিয়া এবং অধিকতর দক্ষ কৃষিসম্প্রসারণ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক নীতি-সহায়তা দিতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বায়োটেকনোলজি, সিস্টেমস মডেলিং এবং জিআইএস সংক্রান্ত গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। এতে করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দক্ষ বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি হবে এবং এই বিজ্ঞানীরা আধুনিক বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে উন্নত থেকে উন্নততর প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পথ খুলে দেবেন।

উপজেলা ও বণ্টক পর্যায়ে কর্মরত সম্প্রসারণকর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি ও জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পত্রিকা ও টেলিভিশনের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed, Raisuddin (1995): "Liberalization of Agricultural Input Markets in Bangladesh: Process, Impact and Lessons," *Agricultural Economics*, 12:115-128.

Ahmed, Raisuddin (2001): *Prospects of the Rice Economy in Bangladesh*, Dhaka: The University Press Limited.

BBS (Bangladesh Bureau of Statistics).Various Years. *Statistical Yearbook of Bangladesh* and *Monthly Statistical Bulletin*, Dhaka, Bangladesh: Ministry of Planning.

——(1999): *Report of the Census of Agriculture 1996*. Dhaka, Bangladesh: Ministry of Planning.

——(2006): *Report of the Household Income and Expenditure Survey 2005*, Dhaka, Bangladesh: Ministry of Planning.

——(2007): *Report of Agricultural Sample Survey 2005*, Dhaka, Bangladesh: Ministry of Planning.

Deb, U.K., Mahabub Hossain and Steve Jones (2009): “Rethinking Food Security Strategy: Self-Sufficiency or Self Reliance,” DFID Research Monograph on Market Volatility, Vulnerability and Food Security, Dhaka: Research and Evaluation Division, BRAC.

GoB (Government of Bangladesh) (2008): *Minor Irrigation Survey Report 2007-08*, Dhaka, Bangladesh: Bangladesh Agriculture Development Corporation, Ministry of Agriculture.

Hossain, M., F. Naher and Q. Shahabuddin (2005): “Food Security and Nutrition in Bangladesh: Progress and Determinants,” *E-journal of Agriculture and Development Economics*, 2(2):103-132.

Hossain, Mahabub (2010): Shallow Tubewells, Boro Rice, and Their Impact on Food Security in Bangladesh,” In D.J. Spielman and R. Pandyal-Lorch (eds.) *Proven Successes in Agricultural Development: A Technical Compendium to Millions Fed*, International Food Policy Research Institute: Washington DC.

Hossain, Mahabub and Abdul Bayes (2010): *Rural Economy and Livelihoods: Insights from Bangladesh*. Dhaka: A.H. Development Publishing House.

Hossain, Mahabub and Uttam Deb (2010): “Volatility in Rice Prices and Policy Responses in Bangladesh,” In David Dawe (ed.) *The Rice Crisis: Markets, Policies and Food Security*.pp.91-108.

——(2009): *Food Security in Bangladesh: Achievement, Challenges and Implication for Policy*, Dhaka: Centre for Policy Dialogue.

Hossain, Mahabub, David Lewis, M.L. Bose and Alamgir Chowdhury (2006b): “Rice Research, Technological Progress and Poverty.” In Adato Michelle and Ruth Meinzen (eds.) *Agricultural Research, Livelihoods and Poverty: Studies of Economic and Social Impact in Six Countries*, Baltimore (USA): The Johns Hopkins University Press.pp.56-102.

Hossain, Mahabub and Z.I. Seraj (2008): “Biotechnology for Crop Improvement: Global Status and Potential Gains for Bangladesh,” In Centre for Policy Dialogue *Emerging Issues in Bangladesh Economy: A Review of Bangladesh Development 2005-06*, Dhaka: University Press Limited.

Hossain, Mahabub, M.L. Bose, and B.A.A. Mustafi (2006a): “Adoption and Productivity Impact of Modern Rice Varieties in Bangladesh,” *The Developing Economies*, 44(2):149-166.

Mandal, M.A.S. (1993): “Groundwater Irrigation in Bangladesh: Access, Competition and Performance,” In Kahnhert F. and Levine G. (eds.) *Groundwater Irrigation*

and the Rural Poor: Options for Development in the Ganges Basin. Report of a World bank Symposium, Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development.

Ministry of Agriculture (1999): *Report of the National Agriculture Commission*, Dhaka: Bangladesh (unpublished).

Shahabuddin, Quazi (2000): "Assessment of Comparative Advantage in Bangladesh Agriculture," *Bangladesh Development Studies*, 26(1):37-76.

Zohir, S., Q. Shahabuddin and M. Hossain (2002): Determinants of Rice Supply and Demand in Bangladesh: Recent Trends and Projections." In M. Sombilla, M. Hossain and B. Hardy (eds.) *Developments in the Asian Rice Economy*, Los Banos, Philippines: IRRI.pp.127-152.

পরিশিষ্ট

চিত্র ১: বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় শস্যচাষের নিবিড়তা, ২০০৫

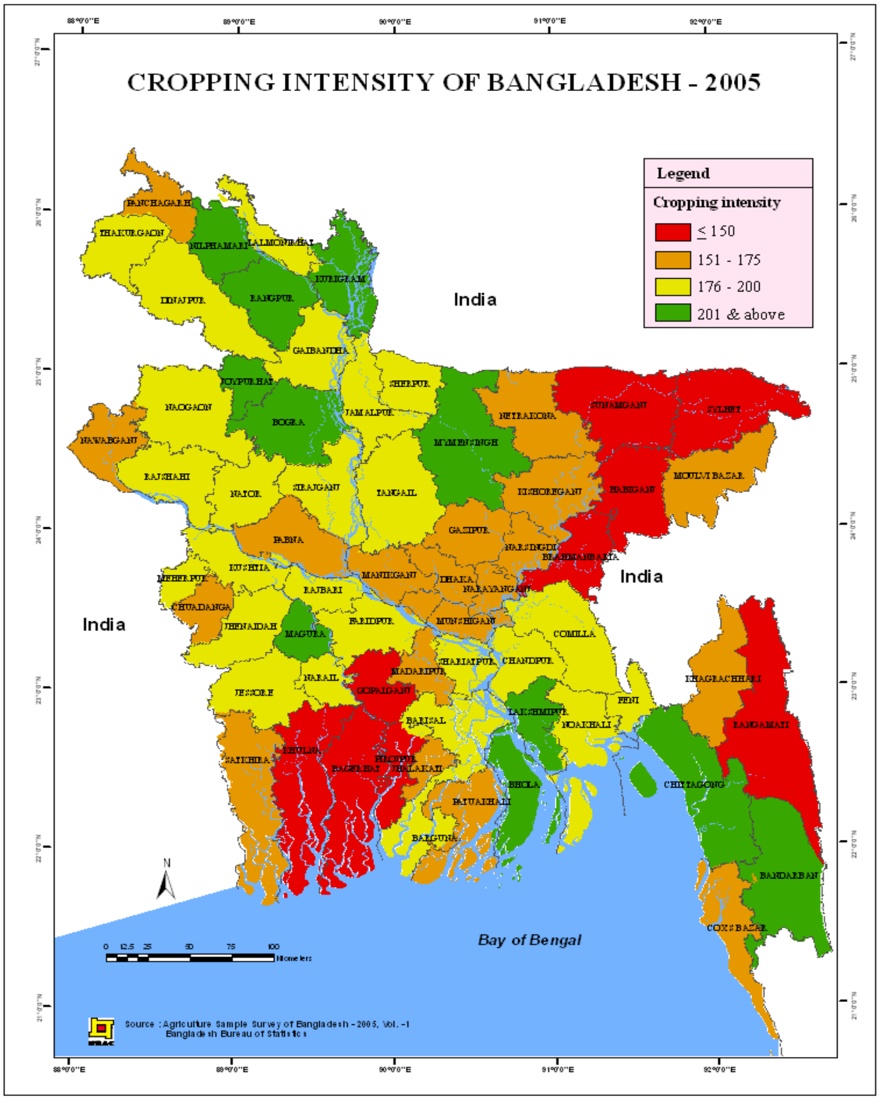

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত বাংলাদেশের কৃষি নমুনা জরিপ ২০০৫-এর উপাত্তের ভিত্তিতে ব্র্যাক কর্তৃক প্রণীত।

চিত্র ২: শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আধুনিক জাতের ধান আবাদের হার, ২০০৫

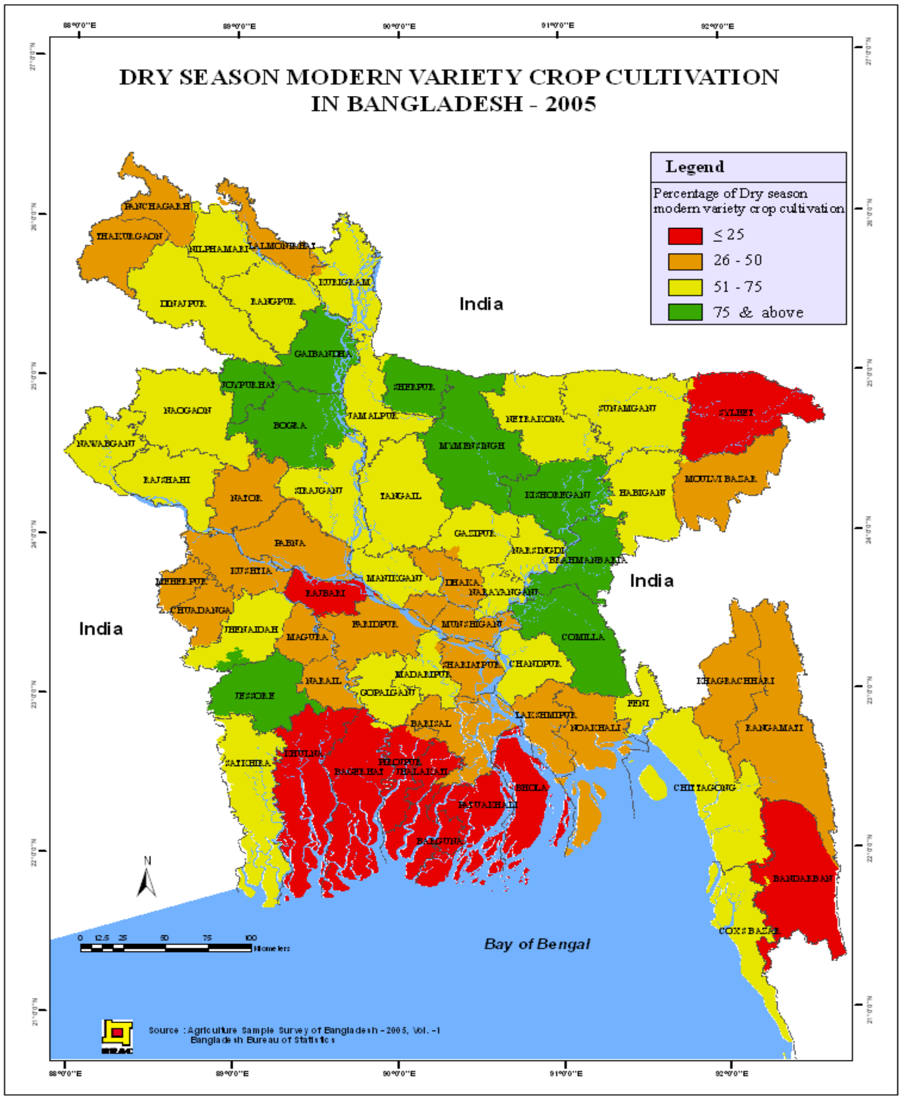

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত বাংলাদেশের কৃষি নমুনা জরিপ ২০০৫-এর উপাত্তের ভিত্তিতে ব্র্যাক কর্তৃক প্রণীত।

চিত্র ৩: বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আধুনিক জাতের আমনধান আবাদের শতকরা হার, ২০০৫